ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 525-532
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.240

বনফুলের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন ও বেকারত্বের সংকট: একটি বিশ্লেষণ

সেখ সাকলিনউদ্দিন, *স্বাধীন গবেষক, কানুড়, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.01.2026; Accepted: 28.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the first half of the twentieth century, Bonoful emerged as a distinctive and realistic short-story writer in Bengali literature. His contributions across all branches of literature—fiction, drama, poetry, and essays—are noteworthy. Beyond his literary identity, he also had another significant role: that of a medical doctor. Through his profession, he came into close contact with people from diverse social strata, and these lived experiences were realistically reflected in his stories.

Bonoful's short stories vary in form—short, long, and medium in length. Some are written in a dramatic mode, resembling dialogues of a play, while others flow with the ease and rhythm of poetry. Each of his stories carries a unique flavour, marked by innovation and freshness. Written in simple language and free from unnecessary embellishment, his stories are easily accessible to readers.

Bonoful's short stories form a gallery of human characters. Although the narratives often proceed along parallel lines in the beginning, they take an unexpected turn at the end, subtly hinting at deeper meanings. With every sentence, the characters come alive. The pain of unemployment and the struggle of middle-class life significantly influence familial and social relationships. Rather than relying on exaggeration or melodrama, these crises emerge in his stories as inevitable truths.

This article offers a nuanced analysis of five of Bonoful's short stories—*Manush*, *Canvasar*, *Pashapashi*, *Bourgeois-Proletariat*, and *Voter Sabitribala*. These stories depict the psychological transformations of middle-class life and characters under the pressure of unemployment and financial scarcity, the erosion of human values, job insecurity, poverty, class conflict, and social decay.

Literature flows like a river, carrying within it political and social themes as well as the economic realities of contemporary India. With human beings as both the subject and inspiration of his writing, Bonoful stands as a truly original and exceptional artist in the world of Bengali short fiction.

Keywords: Bonoful, short story, unemployment, middle-class life, erosion of values, social system, economic crisis, class conflict

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৯ জুলাই মাতৃকোল আলো করে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত মণিহারী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন বনফুল। তারপর পড়াশোনা ও চাকরি করার সূত্রে নানা স্থানে গমন তাঁর জীবনে নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। শুধুমাত্র সাহিত্যিক নন, তিনি একজন সফল চিকিৎসক-ও। চিকিৎসক হিসাবে সমাজের সব শ্রেণির

মানুষের কাছে অনায়াসে পৌঁছাতে পেরেছিলেন এবং তাদের জীবনযাত্রাকে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষের উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মানসিক অবস্থার পরিবর্তন গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করেছিলেন। সমাজে ঘটে যাওয়া সূক্ষ্ম ঘটনাও আতশ কাঁচের মতো বনফুলের চোখে ধরা পড়েছে। অর্জিত অভিজ্ঞতায় মানুষের জীবনকে সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। প্রায় ছ'শোর মতো গল্প, ষাটটি উপন্যাস, কয়েকটি নাটক এবং প্রবন্ধ তাঁর হাতে প্রাণলাভ করেছে। নিজের দক্ষতার বলে নতুন রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিকে, তাই বৈচিত্রেহীনতা ও একঘেয়েমি বনফুলের লেখাকে স্পর্শ করতে পারেনি— আর এখানেই তিনি শ্রেষ্ঠ। শুধুমাত্র মানুষ-ই নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা গাছপালা ও পশু বনফুলের গল্পে স্থান পেয়েছে এবং গল্পগুলি নজরকাড়া হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখায় উঠে আসা সামান্য একটা নিমগাছও পাঠকের মনকে আকর্ষণ করেছে। একটা নিমগাছ কেমন করে অবহেলিত, উপেক্ষিত গৃহবধূর প্রতীকে পরিণত হয়েছে তাও তিনি দেখিয়েছেন মাত্র সাতাশটি বাক্যে যা পাঠককে বিস্মিত করে।

'হাটে বাজারে'-র লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মাত্র তেরো-চোদ্দ বছর বয়সেই বন্ধু ভোলানাথের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে লিখে ফেলেছিলেন 'ময়ূর' নামক একটি কবিতা। সাহিত্যের প্রতি প্রেম ও লেখালেখির প্রতি আকর্ষণের ফলে বলাইচাঁদ আত্মপরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে 'বনফুল' ছদ্মনামের তলায় আশ্রয় নেন। ছদ্মনাম প্রসঙ্গে বনফুল বলেছেন,

> "ছেলেবেলায় ভৃত্যমহলে আমার নামছিল জংলি বাবু। বনজঙ্গল আমি খুব ভালোবাসি।... এই জন্যই বোধহয় ছদ্মনাম নির্বাচনের সময় 'বনফুল' নামটা আমি ঠিক করেছিলাম।"[১]

বাক্যর পর বাক্য সাজিয়ে পৃষ্ঠা ভরাট নয়, মাত্র কয়েকটি শব্দ ও বাক্যে মানবজীবনকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যেন তারা বই-এর পাতা ভেদ করে মিশে গিয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। অল্প কথায় গল্প বলা তাঁর গল্পশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য,তাই সুকুমার সেন লিখেছেন– "বনফুলের গল্পে কারিগরির দিকে ঝোঁক নেই, ঝোঁক আছে আস্ত জীবনের দিকে"[২] আর এখানেই তিনি স্বাতন্ত্র, পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের প্রভাবমুক্ত। সাহিত্যিকরা হয় সামাজিক জীব, সমাজের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিষয় সাধারণের চোখ এড়িয়ে গেলোও সাহিত্যিকদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। বাংলা সাহিত্য জগতে বনফুল এমনি এক নাম, যার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির দৃষ্টান্ত প্রতি গল্পে প্রমান দেয়। তাঁর লেখা গল্পগুলি আকারে ছোটো, বেশিরভাগ গল্প এক থেকে দুই পৃষ্ঠার। গল্পের আকারে নয় কিংবা আবেগে ভেসে যাওয়া নয়, তিনি প্রতি শব্দে আভাস দিয়েছেন মানবজীবনের চরম সত্যের। গল্পের বিষয়বস্ত নির্বাচন করেছেন অন্তরালে থাকা তুচ্ছ, অবহেলিত ও উপেক্ষিত ঘটনাগুলি থেকে। মানুষই তাঁর গল্পের বিষয় কিন্তু লক্ষ্যনীয় মানুষকে নিয়ে তিনি কোনো তত্ত্ব গঠন করেননি। তাই, লেখার মধ্যে তিনি একটা বার্তা দিয়েছেন। তাঁর গল্পগুলি পাঠ করলে পাঠক সহজেই সেই ইঙ্গিত বুঝতে পারে।

মানুষ বলতে তিনি শুধু রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ জাতীয় প্রাণীকে বোঝাননি, বনফুলের লেখায় মানুষ হয়ে উঠেছে নৈতিক পরিচয়ের বাহক। মানবিকতা, দায়িত্ববোধ ও সহানুভূতি অনন্যা প্রাণী থেকে আলাদা করে তুলেছে মানুষকে। গল্পটি মোট চারটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এবং প্রতিটি অনুচ্ছেদই তাৎপর্যপূর্ণ। আলোচ্য গল্পটি গল্পকারের নিজের জবানিতে ব্যক্ত হয়েছে। গল্পের শুরুতেই বলেছেন, 'অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম', যে দৃশ্য আমাদের চোখে বেদনা নয় আরামের অনুভূতি দেয় তার দিকেই অপলক ভাবে তাকিয়ে থাকা যাই। গঙ্গাবক্ষে সূর্যের অস্ত যাওয়া থেকে সুন্দর এই পৃথিবী পর্যন্ত প্রকৃতির শোভা বর্ণিত হয়েছে, সেই রূপে বিহ্বল লেখক বলেছেন–

> "নদীর তীরে ঘাসের উপর তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলাম।"[৩]

তাঁর এই তন্ময়তার কারন প্রকৃতির প্রতি প্রেম। অস্ত যাওয়া সূর্যের লাল আভায় পৃথিবীকে স্বপ্নলোক বলে মনে করেছিলেন কথক। যেখানে কোনো ছলনা নেই, প্রতিকূলতা নেই, সেখানে নৌকাগুলি আপন বেগে স্রোতের অনুকূলে ভেসে যাচ্ছে আর প্রকৃতি নিজের ছন্দে বিরাজমান হয়ে আছে। শ্যামল তীরে দেবালয় আর দেবালয়ের সামনে রোমন্থনরত গাভী, মুদিত নয়ন একটি মার্জার এবং নহবৎ ও পূরবীর আলাপ কথককে মগ্ন থাকতে বাধ্য করেছে।

সহসা চমকে উঠলেন কথক, "আমার পিছনে কে যেন জড়িত কণ্ঠে কথা কহিল। ফিরিয়া দেখি একটি ভিখারী এবং তার সহিত একটি মেয়ে।"[৪] কথক স্বপ্নলোক থেকে মানব জগতে প্রবেশ করলেন, দেখলেন ব্যাধি আর স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। ভিখারীর সম্বল কুষ্ঠ রোগ আর মেয়েটি যৌবনের অধিকারী। তাদের উদ্দেশ্য একই, হাত পেতে একটি পয়সা আদায় করা। কথকের চোখে প্রকৃতির মনমুগ্ধ শোভা আর সমাজের নগ্নরূপ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। একদিকে প্রকৃতির নিরপেক্ষতা, উদারতা আর অন্যদিকে সমাজের বৈষম্য, দরিদ্রতা, ক্ষুধা ও বেঁচে থাকার জন্য মানুষের জীবন সংগ্রাম। একদিকে হিংস্র-কাটাকাটি-দৈন্যতাহীন প্রকৃতি, অন্যদিকে মানুষের গড়া সমাজের বিকৃত রূপ।

এর পরেই গল্পের চরম মুহূর্ত, ক্লাইম্যাক্স। প্রকৃতি নিজের নিয়মে চলমান, দিনের আলো আর রাত্রির অন্ধকারে দিনের সমাপ্তি ঘোষণা স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজকে অন্ধকার গ্রাস করলে সমাজ পঙ্গু হয়ে পড়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কথকের কাছে তার ভাইয়ের চাকরির সংবাদ আসে, কথকের স্বীকারোক্তি-

> "সুসংবাদ। আমার অকর্মণ্য ভাইটির চাকুরি হইয়াছে। এ চাকুরিটার জন্য পাঁচশত প্রার্থী ছিল। বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রে আমার ভাইটির অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠও ছিলো। তবু তাহাদের অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র সুপারিশের জোরে আমার ভাই-ই চাকুরিটা পাইয়াছে।"[৫]

— এই সুসংবাদ সমাজে অনভিপ্রেত। শুধুমাত্র সুপারিশ আর ক্ষমতার জোরে পাঁচশত প্রার্থীকে পিছনে ফেলে ভাইয়ের চাকরি হওয়া; সমাজের বৈষম্য, ক্ষমতার অপব্যবহার আর দ্বিচারিতাকেই প্রকাশ করে যা আজও বিদ্যমান। মাতৃস্তনাভিমুখী বাছুরটিকে প্রাণপনে ধরে রেখে একজন অসৎ মানুষ যেমন বাছুরটির প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে ঠিক তেমনি 'সুপারিশ' বেকারত্বে ক্ষতবিক্ষত পাঁচশত চাকরি প্রার্থীর অধিকার হরণ করেছে। সিগারেটের খালি কেসের মতোই চাকরি প্রার্থীদের রসহীন জীবন সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাজকে চপেটাঘাত করে।

'ক্যানভাসার' নিছক নামকরণ নয়, শব্দটির মধ্য দিয়ে লেখক এক শ্রেনির পেশার মানুষের জীবনযাত্রাকে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়– স্ত্রীর সখ পূরণে অক্ষম বেকার ভৈরব, অভাবের সংসারে কাত্যায়নীর আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন, ক্যানভাসার হীরালালের পণ্য বিক্রয়ের আপ্রাণ চেষ্টা এবং ছলে-বলে-কৌশলে মানুষের সরল মনকে আকর্ষণ করা বিজ্ঞাপনের ভূমিকা। মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে আর রংবাহারে, হীরালালের বাঁধানো দন্তপাট আর কলপ করা কালো কুচকুচে গোঁফ তারই প্রমান দেয়।

গল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ভৈরব ও কাত্যায়নীর দাম্পত্য জীবনের চিত্র পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন । গল্পের শুরুতেই দেখা যায় সাংসারিক কলহের মূল কারণ কাত্যায়নী সখ, কিন্তু পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে কাত্যায়নীর 'সখ' না ভৈরবের 'বেকারত্ব' কলহের বীজরোপণ করেছে–

> "কাত্যায়নীর বহুকাল হইতে একটা সৌখীন শাড়ী কেনার সখ। বেকার ভৈরব অর্থভাবপ্রযুক্ত সে সখ মিটাইতে পারে নাই।"[৬]

বেকার, অর্থসংকটে জর্জরিত ভৈরবের কাছে এই সখ ঝলসানো রুটির মতো, বামন হয়ে চাঁদ ধরার মতো। ভালো শাড়ী কেনার আকাঙ্খা, বিলাসিতা, বাবুয়ানির কাছে মাথা নত করেছে বেকার ভৈরব। দিন আনা দিন খাওয়া মধ্যবিত্ত সংসারে সামান্য খাওয়া-পরার যোগান দিতে না পারা ভৈরব তাচ্ছিল্যর শিকার, কাত্যায়নী বলেছে–

> "যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল ধরে তার আবার বন্ধুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন? এক কড়ার মুরোদ নেই বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার।"[৭]

নিদারুন এই কথা সরাসরি আঘাত করেছে ভৈরবের পৌরুষ ও আত্মসম্মানে, আর তার প্রভাব পড়েছে ক্যানভাসার হীরালালের উপর।

ঘুমে মগ্ন ক্যানভাসার হীরালাল ওভারক্যারেড হয়ে এই পল্লীগ্রামে এসেছে কিছু বিজনেসের আশায়। বেকার ভৈরব এবং অর্থনৈতিক হাহাকারে বিদ্ধ ক্যানভাসারের জীবিকা গ্রহণ করা হীরালাল– মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সখ পূরণে অক্ষম ভৈরব ও সৌখিন পণ্য বিক্রেতা হীরালাল যেন একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। নাছোড়বান্দা হীরালালের কোনো প্রলোভনই ভৈরবকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তাদের কথোপকথন তর্কের রূপ নেয়, ফলে দাম্পত্য কলহ থেকে সৃষ্ট রাগের প্রভাব পড়ে হীরালালের উপর। ভৈরবের চপেটাঘাতে হীরালালের বাঁধানো দন্তপাটি স্থানচ্যুত হয়। এই অত্যাচার, আক্রমণে প্রতিক্রিয়হীন হীরালাল রক্ত-মাংসে গড়া একজন মানুষ এবং তারও সংসার আছে। শুধুমাত্র মাজন বিক্রি আর উপার্জনের আশায় নিশ্চুপ থেকেছে হীরালাল।

ভৈরবের মুখে হীরালালের খাসা দাঁত আর কালো গোঁফের প্রশংসা থাকলেও গল্পের শেষে বিজ্ঞাপনের ভুয়ো আড়ম্বরের মুখোশ খুলে পড়েছে। হীরালালের বাঁধানো দাঁত আর কালো কলপ বিজ্ঞাপনের প্রকৃত সত্যককে উন্মোচন করেছে। নিজের লক্ষ্যে অবিচল হীরালাল যেকোনো উপায়েই তার পণ্য খরিদ্দারের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। বিজ্ঞাপনের সাথে মানবিক সহানুভূতিকে হাতিয়ার করে করুনা লাভের চেষ্টায় সফল হীরালাল। সখ পূরণে অক্ষম বেকার ভৈরব সন্তানের মৃত্যুর শোক সংবাদে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, বলেছে–

> "আচ্ছা, দিন এক কৌটা মাজন।"[৮]

কৃত্রিম মাজনের কাছে শুধু নিম দাঁতনের পরাজয় নয়, বিজ্ঞাপনের কাছে সমাজের সব স্তরের মানুষের আত্মসমর্পণের চিত্র দেখানো হয়েছে। আর্থিক অনিশ্চিয়তায় ভুক্তভুগি হীরালালও সমাজের কাছে অসহায়, তাই ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়েছেন। ছল, প্রতারণা, ভণ্ডামি আধুনিক সমাজের নির্মম বাস্তবতাকে দেখিয়েছে।

বনফুলের সমস্ত গল্পই ভিন্ন স্বাদের, এমনি একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প 'পাশাপাশি'। সরলরেখার একপাশে কথক অন্যপাশে বিকাশ বাবুকে রেখে বেকারত্ব ও অর্থাভাবের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার উপর ব্যঙ্গ করেছেন লেখক। তৎকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে চাকরি, জীবিকার অনিশ্চয়তা লেখককে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছে, আর তারই প্রভাব পড়েছে 'পাশাপাশি' গল্পে। গল্পের শুরুতেই কথক তারই সংকেত দিয়েছেন, বলেছেন–

> "আসল কারণ অর্থাভাব। আমার যাহা করিবার তাহা করিয়াছি। পরীক্ষা পাস করিয়াছি, বহুস্থানে চাকুরির দরখাস্ত দিয়াছি—এমন কি কিছুদিন ইনসিওরেন্সের দালালিও করিয়াছি—কিন্তু কিছু হয় নাই।"[৯]

পরীক্ষায় পাশ করেও কথকের শিক্ষার মূল্যায়নে ব্যর্থ সমাজ। অথচ কর্মহীন, আয়হীন বেকার যুবককে সমাজ কোনো কালেই মূল্য দেয়নি, ছুড়ে ফেলেছে আস্তাকুঁড়ে। কথক নানারকম পরিকল্পনা করেও নিরুপায়, তাই অর্থাভাবে ডুবে যাওয়া গ্রামীণ বেকার যুবক পরিত্রাণের জন্য এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগে

পল্লীগ্রাম ছেড়ে শহরে বিকাশ বাবুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বিকাশের সংসার। প্রতিদিন নিয়ম করে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাওয়া বিকাশকে দেখে বলেছেন–

> "'কাজের মানুষ!' বিকাশ ভায়াকে দেখিয়া হিংসা হয়। কেমন সুন্দর রোজ আপিস যায়, সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে— রাত্রে ভালো ঘুম হয়।"[১০]

এতো কথকের কল্পনা, কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ আলদা। বেকারত্ব গ্রাম ছাড়িয়ে শহরকেও গ্রাস করেছে- পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। রাত্রে ভালো ঘুমের জন্য শুধুমাত্র একটা উপার্জনের পথ সন্ধান করেছেন কথক।

এম.এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া উচ্চ শিক্ষিত বিকাশ তিন বছর অবিরাম চেষ্টা করেও চাকরি জোটাতে অক্ষম হয়েছেন। একদিকে সংসার অন্যদিকে বেকারত্বে বিষাদগ্রস্ত বিকাশ দু'দন্ড শান্তির জন্য ইডেনের বেঞ্চটিকেই বেছে নিয়েছেন—

> "লেট্ হয়ে যাচ্ছে –সে ব্যাটা এসে পড়লে বেঞ্চটা আর পাব না।"[১১]

সামান্য বসার জন্য এখানেও একজন প্রতিযোগী। বাহ্যিক অর্থে বেঞ্চটি বসার আশ্রয় ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ অর্থে বেঞ্চটি একটি প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বেঞ্চটি, বেকারত্বে ডুবে থাকা একটা সমাজের প্রকট সংকটকে প্রকাশ করেছে, যে সংকটে কর্মহীন বহু মানুষ জড়িয়ে পড়ছে গ্রাম-শহর নির্বিশেষে।

আলোচ্য গল্পে চরিত্রগুলো দৈহিক ভাবে পাশাপাশি অবস্থান করলেও তাঁরা নিরুপায়, মানসিক যন্ত্রনায় আহত। শুধু পাশাপাশি হাঁটা বা বসা নয়, চরিত্রগুলি বেকারত্বেও একে-অপরের পাশাপাশি অবস্থান করেছে। পাশাপাশি থেকেও নিরুপায়, ভগ্নপ্রায় সমাজের অর্থ ব্যবস্থার ফলে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি।

বহুভাষী ও বহুজাতির মিশ্রনেই সমাজ গড়ে উঠে। যেখানে ধর্মীয় বিভাজনের পাশাপাশি শ্রেণি বিভাজন, বিশেষ করে ধনী-দরিদ্রর সাংঘাত স্পষ্ট, যার মুলে রয়েছে অর্থব্যবস্থার অসম-বণ্ঠন। অর্থনৈতিক অসম-বণ্ঠনের ফলে এক শ্রেণির মানুষ বিত্তশালী হয়ে ওঠে এবং মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে সমাজে পরিচিত লাভ করে। আর এক শ্রেণি চিরকাল অবহেলিত, শোষিত। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রেণি বিভাজন ও বৈষম্য এবং বনফুলের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মিশ্রন 'বুর্জোয়া প্রোলিটারিয়েট' গল্পটি। আলোচনার পূর্বে নামকরণের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এরা একে অপরের বিপরীত এবং বুর্জোয়া-প্রোলিটারিয়েট শ্রেণির দ্বন্দ্ব ও সংঘাতই গল্পে মূল বিষয়। বুর্জোয়া বলতে সাধারণত বোঝায় পুঁজি ও সম্পদশালী এক শ্রেণিকে যারা সমাজে সম্মান অধিকারের দাবি রাখে। আবার প্রোলিটারিয়েট হল শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণি, যাদের অর্থ উপার্জনের একমাত্র সম্বল শ্রম। প্রোলিটারিয়েটকে ব্যবহার করে, মুনাফা লাভ করা বুর্জোয়ার লক্ষ্য। গল্পকার, 'পেটি বুর্জোয়া হলধর' ও 'প্রোলিটারিয়েট নিধিরাম' শব্দ চয়নের মধ্য দিয়ে প্রথমেই তাদের শ্রেণি বিভাজন করে দিয়েছেন। চরিত্র দুটির আলোচনায় দেখিয়েছেন মধ্যবিত্ত জীবনের উত্থান-পতন, শ্রেণি সংকট ও বৈষম্য, আর্থিক বিপর্যয় এবং আত্মসম্মান রক্ষার দৃঢ় সংকল্প।

চতুর্থ কন্যার বিবাহের ফর্দ করতে ব্যস্ত হলধর মধ্যবিত্ত শ্রেণির একজন ভদ্রলোক। তার সঞ্চিত অর্থ ভান্ডার শেষ, তাই ভোজের খরচে লাগাম টানতে প্রিয় বন্ধু অখিল মিত্রের শরণাপন্ন হন এবং কোনো উপায় না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হলধর বাসায় ফিরে আসেন। সমাজে মর্যাদার সহিত অটুট থাকতে ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলধর নিধিরামের সাহায্য নিয়েছেন। দই বিক্রেতা নিধিরাম যেমন বিশ টাকা মণের দই বিক্রি করেন তেমনি তার কাছে পাওয়া যায় পনেরো-দশ-পাঁচ টাকা মণের দই-ও। চিন্তাগ্রস্ত হলধর অনেক চিন্তা করে পঁচিশ টাকা বাঁচানোর উপায় খুঁজে পান এবং পাঁচ টাকা মণের দু'মণ দই বায়না দেন। এই নিরেশ দই মুখে পড়তেই নিন্দার ঝড় উঠবে তাই ষড়যন্ত্র করেছেন—

> "বলছি নিন্দে-টিন্দে যদি কেউ করে তখন তোমাকে ডেকে আমি একটু ধমক-টমক দেবো। ভাবটা যেন তোমাকে আমি ভালো দই-ই দিতে বলেছিলাম তুমি যেন আমাকে ঠকিয়েছ।"[১২]

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হলধর ঠুনকো সমাজ ব্যবস্থার শিকার, নিজের মান বাঁচাতে নিধিরামকে তুরূপের তাসের মতো ব্যবহার করেন। তুরূপের তাসকে যেমন কঠিন মুহূর্তে জয়লাভ করতে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে, ঠিক তেমনি নিজের মান বাঁচাতে মরিয়া হলধর নিধিরামকে অস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করেছে। সমাজের উপর তলার মানুষের কাছে নিচের তলার মানুষ শোষণের শিকার, তাই শেষ পর্যন্ত নিধিরামের করুণ পরিস্থিতি পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সমাজ ব্যবস্থার নগ্নরূপ। একটাকা বেশি লাভের আশায় সম্মত নিধিরাম নিজের সম্মানের তোয়াক্কা না করেই অর্থের কাছে মাথানত করেছেন। হলধরের আত্মসম্মান রক্ষার চেষ্টা আর অর্থের কাছে নিজের সম্মান বিক্রেতা নিধিরামের অবস্থান গল্পটিকে পূর্ণতা দান করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গল্পের মূলভাব উদয় হয়েছে। অখাদ্য দই বরযাত্রী মুখে নিতেই বারুদের মতো বিস্ফোরণ ঘটে গেল। অর্থ নয়, ভদ্রতা রক্ষা করতেই ভদ্রলোক হলধরের এই কার্পণ্য শ্রেণি বৈষম্যকে ইঙ্গিত করে। হলধরের সাজানো ফাঁদে জড়িয়ে অসহায় নিধিরামের কপালে ধন্যবাদের পরিবর্তে জুটেছে হারামজাদা, জুয়াচোর, পাজি উপাধি। শর নিক্ষেপ হওয়া হরিণ যেমন বাঁচার জন্য ছটপট করে, সেরকম নিন্দার বাণে আঘাত পাওয়া হলধর সমাজের কাছে নিজেকে প্রমান করতে নিধিরামের গালে সজোরে আঘাত করে —

> "নিধিরাম মুখ তুলিয়া বলিল, চড় মারবার কথা তো ছিলো না। চড় মারলেন যে বড়! আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোক রয়েছেন, বিচার করুন আপনারা—"[১৩]

প্রতিবাদের স্বরও হলধরের দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত। শাসকের কাছে শাসকের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ অর্থহীন।

আলোচ্য গল্পে লেখক মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরেছেন, কিন্তু বর্তমান সমাজ প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বিষয়ের গভীরতা স্বীকার করতেই হয়। আর্থিক ও মানসিকভাবে বুর্জোয়া হলধরের পূর্বে অর্জিত সামাজিক মর্যদা রক্ষার প্রয়াস ও ব্যর্থতা- তার আত্মদ্বন্দ্বের মূল কারণ। গল্পটি গতানুগতিক কাহিনি নয়, শ্রেণি বৈষম্য ও শ্রেণি সংকটে পিষ্ট মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের একটি তীক্ষ্ণ দলিল।

মানুষ রাজনৈতিক জীব, প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ ভাবে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আবৃত। মানুষের দৈনিক জীবনযাত্রায় রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে রাজনীতির মিশ্রনে লেখা বনফুলের 'ভোটার সাবিত্রীবালা' গল্পটি। গল্পের প্রধান চরিত্র সাবিত্রী পেশায় একজন রাঁধুনি। স্বামী মোহনাশ এবং পুত্র রিপুনাশ ও তমোনাশকে নিয়ে তার অভাবের সংসার। টোলের পণ্ডিত মোহনাশ তর্কতীর্থ সমাজে কদরহীন ও অতিশয় দরিদ্র মানুষ। এই দরিদ্র অবস্থার জন্য সাবিত্রীর সংসারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। যক্ষায় আক্রান্ত রিপুনাশ, অর্থের অভাবে সাবিত্রী রিপুনাশের চিকিৎসা করাতে পারেননি। বন্ধুর মুখে গল্প শুনেছে রিপুনাশ—

> "হরু জেল থেকে ভালো হয়ে ফিরে এসেছে। তার যক্ষা হয়েছিল। সেখানে খুব ভালো হাসপাতাল আছে। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে।"[১৪]

তাই বাঁচার তাগিদে, বিনা পয়সার চিকিৎসার জন্য ট্রামে চুরি করে এক মাসের জন্য জেল খাটে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এক মাসের মধ্যেই মারা যায়। শুধুমাত্র বিনা পয়সায় চিকিৎসার জন্য জেলখানার চার দেওয়ালের বদ্ধ জীবনকেই বেছে নিয়েছে- দরিদ্র জীবনে দায়বদ্ধ রিপুনাশের জীবন যন্ত্রনার কঠিন বাস্তবতাকে লেখক দেখিয়েছেন।

সাবিত্রীবালা একজন ভোটার এবং সংসারের কর্ত্রী। দীর্ঘদিন ধরে অভাবের সংসারকে টিকিয়ে রাখতে তার অনবদ্য লড়াই। অর্থের অভাবে চিকিৎসাহীন বিদ্বান স্বামী ও ছোট ছেলে রিপুনাশের মৃত্যু সাবিত্রীকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তাই ভোট চাইতে আসা ভোট প্রার্থীকে কাছে পেয়ে যোগ্য জবাব দিয়েছেন, বলেছেন—

> "ছোট ছেলেটা মল যক্ষায়, তার কোনও চিকিৎসা হ'ল না, সর্বত্র ঘুষ চায়। আপনাদের ভোট দেব কেন..."[১৫]

আলোচ্য গল্পগুলির মাধ্যমে গল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় নিজের চোখে দেখা এবং অনুভব করা মধ্যবিত্ত সমাজে জীবনের কঠিন বাস্তবতা ও সত্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ঘটনার-ঘনঘটা বর্জিত, জটিলতাহীন সহজ-সরল ভাষা গল্পের বিষয়কে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। প্রতিটি গল্প স্বাভাবিক ভাবে শুরু করলেও সমাপ্তিতে পাঠককে চমকে দিয়েছেন বনফুল। বনফুলের দক্ষ হাতে প্রাণ পাওয়া, রক্ত-মাংসে গড়া চরিত্রগুলি তৎকালীন সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সেজন্যই, গল্পের কেন্দ্রবিন্দু মধ্যবিত্ত জীবন ও বেকারত্ব হলেও পুনরাবৃত্তি তাঁর লেখায় দেখা যায় না, আর এই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির জন্যই তিনি অনন্য শিল্প।

তথ্যসূত্র:

১. বনফুল। পশ্চাৎপট। চতুর্থ বাণীশিল্প সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৪২।

২. মিত্র, সরোজমহন। ছোটগল্পের বিচিত্র কথা। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ: ১৯৬৪, পৃ. ২৩৮।

৩. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ২১১।

৪. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ২১১।

৫. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ২১৩।

৬. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ১৬৪।

৭. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ১৬৪।

৮. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ১৬৫।

৯. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ১৪৬।

১০. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ১৪৮।

১১. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ১৪৯।

১২. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ৩৯২।

১৩. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ৩৯৩।

১৪. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ৩১৪।

১৫. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ৩১৪-৩১৫।